নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ২৪, পৃ. ৩৩-৫০
© ২০১৯ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানায় রচিত প্রথম এথনোগ্রাফি পাঠের অভিজ্ঞতা ও বর্তমান সময়ে ঐ এথনোগ্রাফির প্রাসঙ্গিকতা

মু. মুজীবুল আনাম*
মোঃ আবুল কালাম**

ভূমিকা

এ প্রবন্ধে অধ্যাপক তাদাহিকো হারার এথনোগ্রাফি "Paribar and Kinship in a Moslem rural village in East Pakistan" (পূর্ব পাকিস্তানের একটি মুসলিম গ্রামের পরিবার ও জ্ঞাতি সম্পর্ক) পাঠের অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান সময়ে এই এথনোগ্রাফির প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করা হবে। অধ্যাপক হারার এথনোগ্রাফিটি তাঁর পিএইচডি কাজের অংশ। ১৯৬৭ সালে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে এই এথনোগ্রাফিক গবেষণা পত্রটি জমা দেন। এর আগে ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার গহীরা ইউনিয়নে মাঠকর্ম করেন। অধ্যাপক হারা যে সময় এ অঞ্চলে তাঁর এথনোগ্রাফিক মাঠকর্ম করেছেন, সেই সময় পর্যন্ত এই অঞ্চলে কোন এথনোগ্রাফিক কাজের সন্ধান পাওয়া যায় না। একারণে বাংলাদেশ ভৌগলিক সীমানায় রচিত এথনোগ্রাফিগুলোর মধ্যে অধ্যাপক হারার এথনোগ্রাফিটি সম্ভবত প্রথম। সময়কাল বিবেচনায় এই এথনোগ্রাফিটি বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞান এর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু এই এথনোগ্রাফিটি নিয়ে বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞানে খুব একটা আলোচনা লক্ষ্য করা যায় না। এই কারণে এ প্রবন্ধের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে এথনোগ্রাফিটিকে বাংলাভাষী পাঠকদের মধ্যে পরিচিত করা।

অধ্যাপক হারা'র এথনোগ্রাফির কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল গ্রামীন সমাজে জ্ঞাতি সম্পর্ক ও পরিবারের বৈশিষ্ট্য বোঝা। এর সাথে ঐ এলাকায় পরিবার গঠনে ইসলাম ধর্মের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা। তিনি জানান যে, ঐ সময়ে মুসলিম পরিবার ও জ্ঞাতি সম্পর্ক নিয়ে খুব অল্প সংখ্যক সমাজবিজ্ঞান বা নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছিল। সে সময় এ সংক্রান্ত যেসকল গবেষণা পাওয়া যায় সেগুলোতে মুসলিম পরিবারকে সর্বজনীন হিসেবে দেখা হতো। উদাহরণ হিসেবে তিনি Gaudefroy-Demombynes (১৯৫০) এবং Jeffery (১৯৫৯)- এর কাজের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, ঐ কাজগুলোতে মুসলিম পরিবার সর্বজনীন হিসেবে দেখানো হয়েছিল এবং এর সমরূপতা পৃথিবীর সকল সমাজে লক্ষ করা যায় বলে তাঁরা উল্লেখ করেন। কিন্তু অধ্যাপক হারা তাঁর এথনোগ্রাফিতে দেখান যে, গহীরার মুসলিম পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক আরবদের পরিবার ও জ্ঞাতি সম্পর্কের মতো নয়। বরং পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থানীয় যে সাংস্কৃতিক বিষয় ও সামাজিক নির্ণায়ক রয়েছে সেগুলো পরিবারের গঠন, পরিবারের ভাঙ্গন এবং সর্বপরি পরিবারকে একটি স্থানিক আদলের প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে প্রভাবিত করে। মুসলিম পরিবার বিষয়ক আলোচনায় অধ্যাপক হারা'র এই যুক্তি তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে বলে আমরা মনে করি।

* সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।
** গবেষণা বিশ্লেষক, হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস, গুলশান-২, ঢাকা।

জ্ঞাতিসম্পর্কের বিভিন্ন মাত্রা চিহ্নিত করা তাঁর এই এথনোগ্রাফির আরো একটি অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয়। জ্ঞাতিসম্পর্ক বিষয়ক আলোচনায় আমরা দেখতে পাই যে, মুসলিম সমাজে জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলি ব্যবহারের বৈচিত্র্য রয়েছে। জ্ঞাতিসম্পর্ক আলোচনায় বসতির ধরন যে গুরুত্বপূর্ণ তা তিনি তাঁর এথনোগ্রাফিতে দেখিয়েছেন। পাশাপাশি জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরনের সাথে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যে ধরনের উদ্বেগ কাজ করে তা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক হারা যৌনতা নিয়েও আলোচনা করেন। মুসলিম সমাজের প্রেক্ষিতে তিনি যৌনতা'র ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন। স্থানীয়দের যৌনতা বিষয়ক ধারণার যে বর্ণনা অধ্যাপক হারা তাঁর এথনোগ্রাফিতে তুলে ধরেন তা থেকে আমরা দেখি যে, ধর্মীয় বোঝাপড়ার বাইরে স্থানিক সাংস্কৃতিক পরিসর যৌনতা ধারণা বিষয়ক বোঝাপড়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। আমেরিকান নৃবিজ্ঞানী মার্গারেট মীড সামোয়ানদের (Mead, ১৯২৮) নিয়ে যে কাজ করেন সেখানে আমরা ব্যক্তিত্বের বিকাশের সাথে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের গুরুত্ব দেখতে পাই। অধ্যাপক হারা'র এথনোগ্রাফিতে মার্গারেট মীড এর রেফারেন্স না থাকলেও আমরা লক্ষ করি ধর্মীয় রোঝাপড়া কিংবা যৌনতা সংক্রান্ত ধারণায়নের সাথে সংস্কৃতির যোগকে তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন। এই ধারাবাহিকতায় তিনি ধর্মীয় পরিমন্ডলের সাথে ব্যক্তির যে ব্যক্তিক (individual) ভাবনা তৈরি হয় তার স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

অধ্যাপক হারা পেশা সংক্রান্ত আলোচনায় দেখিয়েছেন যে, গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি কাজের মূল উপকরণ হিসেবে তিনি ভূমির মালিকানা ও হস্তান্তরের বিভিন্ন মাত্রা দেখিয়েছেন। ভূমির মালিকানার সাথে সমাজের বিভিন্ন মানুষের সম্পর্ক, ভূমিকে কেন্দ্র করে সামাজিক সম্পর্ক টিকে থাকার ধরন এবং নতুন সম্পর্ক তৈরি হওয়ার ধরন নিয়ে আলোচনা করেছেন। উৎপাদন ব্যবস্থা কেন্দ্রিক আলোচনা থেকে দেখা যায় ধর্মীয় অনুশাসনের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলো পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

অধ্যাপক হারার এথনোগ্রাফি থেকে একদিকে যেমন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরটি বুঝা যায় তেমনি এর সাথে ইসলাম ধর্মের আদর্শের দিকগুলোর সাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের যোগাযোগও তিনি দেখিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁর এই এথনোগ্রাফিটি এমন এক সময়ের কাজ যখন এই অঞ্চলে আর কোন এথনোগ্রাফিক কাজের সন্ধান পাওয়া যায় না। ফলে পরিবার, জ্ঞাতিসম্পর্ক, সামাজিক সম্পর্ক ও এর সাথে ইসলাম ধর্মের পরিবর্তনশীলতা বুঝতে এথনোগ্রাফিটি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রবন্ধটির শুরুতে অধ্যাপক হারার সংক্ষিপ্ত একটি পরিচয় থাকবে। এরপর এথনোগ্রাফিটির অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনা করা হবে। অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনায় প্রতিটি অধ্যায়ের কেন্দ্রীয় বিষয়ের সাথে বর্তমান সময়ে এই এথনোগ্রাফিটির প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা হবে।

অধ্যাপক তাদাহিকো হারা (Tadahiko Hara)

অধ্যাপক হারা ১৯৩৪ সালে জাপানের ওসাকায় জন্মগ্রহন করেন। তিনি টোকিও ইউনিভার্সিটি এবং অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে পড়ালেখা করেছেন এবং পরবর্তীতে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত টোকিও ইউনিভার্সিটি অব ফরেন স্টাডিজ এ অধ্যাপনা করেন।

অধ্যাপক হারা জাপানসহ বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান), ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া এবং ভারতে মাঠকর্ম করেছেন (Uberoi, 1991)। একাডেমিক গবেষণায় তিনি তিনটি বিষয়ের সাথে যুক্ত ছিলেন: বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের মুসলিম সমাজসমূহে গবেষণা, দক্ষিণ ভারতের গ্রামীণ সমাজে আন্তঃবিভাগীয় গবেষণা, জাপান, আমেরিকা, ভারত এবং অন্যান্য স্থানে জনসংস্কৃতি নিয়ে

তুলনামূলক গবেষণা (Uberoi, 1991)। অধ্যাপক হারা শুধুমাত্র তাত্ত্বিকভাবে পারদর্শী ছিলেন না, বরং তিনি বিশ্বাস করতেন যে বাস্তবিক/অনুশীলনে যেসকল সমস্যা দেখা যায় সেগুলো সমাধানে নৃবিজ্ঞান কার্যকরী টুল প্রদান করতে সক্ষম। তিনি গ্রামীণ উন্নয়ন, জনসংখ্যা সমস্যা এবং বৈচিত্র্যময় সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে যেসকল প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি কাজ করে তাদেরকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন (Yamaguchi, 1991)।

১৯৬২-৬৪ সাল পর্যন্ত মাঠকর্মের পর অধ্যাপক হারা নিয়মিতভাবে বাংলাদেশে মাঠকর্ম ভিত্তিক গবেষণা করতেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে তিনি বাংলাদেশে মাঠকর্ম করতে আসেন। ঐ সময় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল চট্টগ্রামের রাউজানের গহীরায় যেখানে তিনি তাঁর পিএইচডি গবেষণার মাঠকর্মটি করেছিলেন সেখানে পুনরায় মাঠকর্ম করা। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত তাঁর কাজের মাঝখানে তিনি অসুস্থ হন এবং ১৯৯০ সালে ৬ জানুয়ারি ঢাকার একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন (Yamaguchi, 1991)।

অধ্যাপক হারার পূর্ব পাকিস্থানের একটি মুসলিম গ্রামের পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক বিষয়ক এথনোগ্রাফিটি তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৯১ সালে The Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa থেকে প্রকাশিত হয়। আমাদের এই প্রবন্ধ ১৯৯১ সালে প্রকাশিত এথনোগ্রাফির আলোকে রচিত।

অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনা

"Paribar and Kinship in a Moslem rural village in East Pakistan" এথনোগ্রাফিটিতে মোট আটটি অধ্যায় আছে। নিচে অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনার মধ্য দিয়ে এই এথনোগ্রাফিটির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় ১- ভূমিকা

অধ্যায় ১ এ অধ্যাপক হারা তাঁর গবেষণা এলাকা গহীরার পরিচয় তুলে ধরেন। তিনি তাঁর গবেষণা এলাকার ভৌগলিক সীমানা বোঝানোর জন্য তৎকালীন গ্রাম ও প্রশাসনিক এলাকার ধারণা দেন। আমরা লক্ষ করি যে, তিনি মুসলিম সমাজের পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে করা এই এথনোগ্রাফিটিতে প্রধানত গহীরা ইউনিয়নের শিকদার বাড়ি সংলগ্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর নিবিড় মাঠকর্ম করেন। অধ্যাপক হারার এথনোগ্রাফি থেকে আমরা জানতে পারি তখন ঐ অঞ্চলের মুসলিমরা প্রধানত সুন্নি উপদলের হানাফী মতাদর্শের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। ঐ সময়ে নতুনভাবে গড়ে ওঠা ওয়াহাবী সংস্কারক মতাদর্শের কিছুসংখ্যক লোক ছিল তবুও তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য ছিল না, বরং তারা একসাথেই বসবাস করতেন। তবে এই প্রথাগত মুসলিম এবং সংস্কারবাদী ওয়াহাবী মতাদর্শীদের মধ্যে একটি অদৃশ্যমান মানসিক দ্বন্দ্ব ছিল বলে অধ্যাপক হারা তাঁর এথনোগ্রাফিতে উল্লেখ করেন। তবে তিনি মনে করেন ঐ অঞ্চলের মুসলমানরা তাদের সাধারণ আইন এবং প্রাথমিক মতবাদগুলো, যা সাধারণত মুসলিমদের পাঁচটি মৌলিক বিষয় হিসেবে পরিচিত, একইভাবে মেনে চলত। অধ্যাপক হারার এথনোগ্রাফি থেকে ঐ অঞ্চলের মুসলিমদের ধর্ম চর্চার ও ধর্ম সংস্কারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও উঠে আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে ওঠা ওয়াহাবী সংস্কারক মতাদর্শের প্রভাব চট্টগ্রাম অঞ্চলে দেখা যায়, যা অধ্যাপক হারা তাঁর ১৯৬২-১৯৬৪ সাল পর্যন্ত মাঠকর্মের সময় লক্ষ করেন। বর্তমান সময়কালে বাংলাদেশে ইসলাম বিষয়ক বিশেষত ওয়াহাবী মতাদর্শ নিয়ে এথনোগ্রাফিক কাজের ক্ষেত্রে অধ্যাপক হারার ১৯৬২-

১৯৬৪ সালের এই এথনোগ্রাফিক উপাত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে কাজে লাগতে পারে বলে আমরা মনে করি।

এ অধ্যায়ে ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের ধর্ম চর্চার ধরন পর্যালোচনার পাশাপাশি অন্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। অধ্যাপক হারা তাঁর গবেষণা এলাকায় বসবাসকারী তিনটি ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক লক্ষ করেন। তিনি দেখান যে, ঐ সময় প্রায় প্রত্যেক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে ভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা অংশগ্রহণ করত এবং একে অন্যের সাথে মিশে যেত। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন বিয়ের মতো অনুষ্ঠানগুলোতে ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের একসাথে খাবার খাওয়া স্বাভাবিক বিষয় ছিল। গহীরা গ্রামে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,

> "১৯৬৩ সালের ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলাকালীন গ্রামে (গহীরা) হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর ডাকাতি ব্যতীত কোন ঘটনা ঘটে নাই কিন্তু বেশিরভাগ মুসলমান তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের ডাকাতি থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করেছে। বাহিরের মানুষদের বিপক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলা যেমন ফুটবল খেলার মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ গ্রামের সম্মান রক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এ গ্রামের মুসলমান বড় কর্মকর্তার কথা ভেবে হিন্দু ও বৌদ্ধরাও গর্ববোধ করে কারণ তারা একই গ্রামের (হারা, ১৯৯১; পৃ.৭)।"

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এত ভাল নিদর্শন থাকার পরও অধ্যাপক হারার গবেষণার কয়েক বছর পর ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভিন্ন পরিস্থিতি লক্ষ করা যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় অধ্যাপক হারার গবেষণার এলাকা সংলগ্ন কুন্ডেশরী ঔষধালয়ে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটে (আহমেদ, ২০১৪)। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই পরিবর্তন বুঝতে এই এথনোগ্রাফিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হিসেবে কাজ করবে বলে আমরা মনে করি।

এ অধ্যায়ে অধ্যাপক হারা গহীরার ভৌগলিক অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জনস্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিষয়ক আলোচনা তুলে ধরেন। এই প্রতিটি বিষয়ে ১৯৬২- ৬৪ সালের প্রেক্ষাপটের সাথে বর্তমান সময়ের পরিবর্তনশীলতা বুঝতে এ এথনোগ্রাফি সাহায্য করবে।

অধ্যায় ২- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা, সমতা, যৌনতা এবং সম্মান

এ অধ্যায়ে অধ্যাপক হারা কিছু নির্বাচিত বিশ্বাস ও ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাইরের জগত সম্পর্কে স্থানীয়দের ধারণা ও যৌনতা বিষয়ক আলোচনা।

অধ্যাপক হারা বাইরের জগত সম্পর্কে আলোচনায় অতিপ্রাকৃতিক জগত সম্পর্কে স্থানীয়দের বিশ্বাসগুলো তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, অধিকাংশ গ্রামবাসী বিশ্বাস করেন যে অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা কেবল স্রষ্টার একার রয়েছে। খুবই কম ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা মৃত ব্যক্তির আত্মাকে অতিপ্রাকৃতিক শক্তি দেন এবং তাদেরকে জাগতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দেন। তিনি স্থানীয়দের ব্যক্তিগত জীবনবোধকে চারটি পর্যায়ে দেখেতে পান জন্মের পূর্বের পর্যায়, ইহজগৎ, মৃত্যুর পর থেকে শেষ বিচার পর্যন্ত সময় এবং শেষ বিচারের পরের জগৎ। তিনি এই চারটি জগতের আলোচনার মধ্যে দিয়ে সৃষ্টিকর্তার সাথে স্থানীয়দের সম্পর্ককে তুলে ধরেন। তিনি দেখান যে, মানুষের সৃষ্টি নিয়ে স্থানীয়রা যে ব্যাখ্যা তাঁর সামনে তুলে ধরেন তাতে মানুষ মাটির তৈরি একটি প্রাণী, যেখানে সৃষ্টিকর্তা নিজ হাতে মানুষকে তৈরি করেছেন বলে বিশ্বাস করা হয়। অধ্যাপক হারা তাঁর এই আলোচনার প্রতিটি ক্ষেত্রে কেস স্ট্যাডি তুলে ধরেন। সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক স্থানীয় সাধারণ ধারণার

সাথে তাঁর উল্লেখিত কেস স্ট্যাডিগুলো যেকোন পাঠককে এ সম্পর্কে এথনোগ্রাফিক কাজের গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করবে।

অধ্যাপক হারা অতিপ্রাকৃতিক বিষয়কে কেবল সৃষ্টিতত্ত্ব কিংবা স্রষ্টার প্রতি সাধারণের আনুগত্যের আলোচনায় সীমিত রাখেননি। বরং তিনি সেই অতিপ্রাকৃতিক ধারণার সাথে সমাজ জীবনের সম্পর্কগুলোকে তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে তিনি তাকদির তথা নিয়তি সম্পর্কে স্থানীয় ধারণার ব্যাখ্যা দেন। স্থানীয়রা তাদের সফলতার সাথে নিয়তি কিংবা সাধারণ অর্থে ভাগ্যের গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তবে অধ্যাপক হারা দেখান যে, তাকদির এর ধারণাকে মানুষ বিশ্বাস করলেও তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে। তারা মনে করে এই চেষ্টা করে তারা তাদের সফলতা আনতে পারেন। অধ্যাপক হারা মনে করেন তাকদির এর ধারণা মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করে ব্যক্তিগত সফলতার সর্বোচ্চ স্থানে নিতে অনুপ্রাণিত করে। স্থানীয়দের এই বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

> "জীবনে ব্যর্থতার কারণে আমি কাউকে আত্মহত্যা করতে কিংবা ব্যক্তিগত ব্যর্থতার কারণে বিষণ্ন অবস্থায় থাকতে দেখিনি। একজন ব্যক্তিকে একটি ব্যর্থতার জন্য ব্যর্থ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় না। একজন ব্যক্তি চিন্তা করে যে, 'কে বলতে পারবে যে সৃষ্টিকর্তা আমাকে এখানে সুযোগ দিচ্ছে না, তার মানে অন্যটাতেও দিবে না?' এই দিক থেকে তারা আশাবাদী (হারা, ১৯৯১; .২০)"।

অধ্যাপক হারা মানুষের ধর্ম বিশ্বাসগুলো যেমন পর্যালোচনা করেছেন, তেমনি তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন ঐ ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো স্থানীয় জীবন যাপনে কী করে ক্রিয়াশীল।

এ অধ্যায়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যৌনতা বিষয়ক স্থানীয়দের বোঝাপড়া। বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞানে যৌনতা বিষয়ক আলোচনা এখন পর্যন্ত একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। কিন্তু অধ্যাপক হারা ১৯৬২- ৬৪ সালের মাঠকর্মের সময় এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে স্থানীয়রা দুইভাবে যৌনতাকে ব্যাখ্যা করেঃ যৌন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি (যৌন শক্তি) এবং পুনরুৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার (সন্তান প্রসব)। অধ্যাপক হারার এথনোগ্রাফিতে যৌন শক্তি বিষয়ক যে আলোচনা আমরা পাই, সমসাময়িক সময়ে যৌন শক্তি বিষয়ক আলোচনাতে একই ধরনের ব্যাখ্যা লক্ষ করা যায়। যেমন এ এথনোগ্রাফিতে আমরা পাই যে, স্থানীয়রা যৌনতাকে উপভোগের বিষয় হিসেবে দেখে এবং তারা মনে করে নারী-পুরুষ উভয়ে যেন যৌন পরিতৃপ্তি পায় তা ধর্মীয়ভাবে নির্দেশিত। আনাম (২০১৭) তাঁর এথনোগ্রাফিতে যৌন তৃপ্তির সাথে ধর্মীয় অনুশাসনের সম্পর্ক বিষয়ক একই ধরনের আলোচনা তুলে ধরেন। আনামের এথনোগ্রাফিটি ঢাকা শহরের প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক সময়ে রচিত। আমরা দেখি যে, এ অঞ্চলের যৌনতা বিষয়ক ভাবনায় ১৯৬২-৬৪ সালে যে ধরনের আলোচনা লক্ষ করা যায় তার অনেক বিষয় এখনও সমভাবে প্রযোজ্য। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যৌনতা বিষয়ক এথনোগ্রাফিক কাজে এ কারণে অধ্যাপক হারার এই এথনোগ্রাফিটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি সূত্র হিসেবে কাজ করবে।

অধ্যাপক হারা এ অধ্যায়ের আলোচনায় গবেষণার পদ্ধতিগত একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করেন। গবেষণাকালীন 'অতীত' নিয়ে গ্রামবাসীদের উদাসীনতা তাকে আঘাত দেয়। তিনি লক্ষ করেন যে, একটি বাড়িতেও বংশতালিকা লিখিত আকারে ছিল না। এমনকি কিছু কিছু ব্যক্তি নিজের দাদাদের নামও ঠিকমত বলতে পারেন নি। অভিবাসী বংশধরেরা অনেকেই তাদের পূর্বসূরিদের অভিবাসনের ইতিহাস বলতে পারেন নি। এছাড়া ঐ গ্রামের কোন লিখিত ইতিহাসও তিনি পাননি। তিনি বলেন, "আমি অতীতের আঞ্চলিক অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য পেতে সমস্যার সম্মুখীন

হয়েছি (হারা, ১৯৯১; পৃ.১৮)"। তিনি যখন অতীত বিষয়ক কোন প্রশ্ন করতেন প্রায়শই এ রকম উত্তর পেতেন: "আমি মনে করতে পারছি না", "আমি জানি না", "অতীত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে কী হবে?" কিংবা "এখনকার মতোই অবস্থা ছিল"।

অধ্যাপক হারার এই হতাশা কিন্তু অন্য এথনোগ্রাফারদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। আমাদের নিজেদের গবেষণাতে আমরা প্রায়শই একই ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। এক্ষেত্রে এ ধরনের অবস্থায় একজন এথনোগ্রাফারের করণীয় কী হতে পারে তা নিয়ে অধ্যাপক হারা আমাদের ভাবনার সুযোগ করে দেন।

অধ্যাপক হারা যে সময়ে কাজ করেছেন (১৯৬২-১৯৬৪) সেই সময়ের এথনোগ্রাফিক বর্ণনায় উপাত্ত না পাওয়ার বিশেষ করে ঐতিহাসিক উপাত্ত না পাওয়ার সংকট বিষয়ক আলোচনা আমরা পাই না। ১৯৮৬ সালের দিকে Writing Culture বিতর্ক এই ধরনের সংকটগুলোকে সামনে নিয়ে আসে। যেখানে এথনোগ্রাফারদের মাঠকর্মের সংকটের স্বীকার করে নিয়ে এথনোগ্রাফি লেখার নতুন প্রস্তাবনা আসে। আমরা মনে করি অধ্যাপক হারা তাঁর এথনোগ্রাফিক বর্ণনায় ঐতিহাসিক উপাত্তে যে সংকট থাকতে পারে তা পরিষ্কার করেছেন। যদিও তাঁর বর্ণনায় সেই চ্যালেঞ্জের বহিঃপ্রকাশ পূর্ণাঙ্গভাবে আসেনি। আমরা মনে করি অধ্যাপক হারা'র অতীত উপাত্ত বিষয়ক অনুসন্ধান এথনোগ্রাফিক সত্যের যে আংশিক রূপই কেবল বর্ণনা করা সম্ভব সেই ব্যাখ্যাকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।

সময়কাল বিবেচনায় অধ্যাপক হারা'র এথনোগ্রাফিক মাঠকর্মের পর ১৯৬৭-৬৮ সালের দিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মাঠকর্ম করেন পিটার জে. বার্টোসী। মাঠকর্ম করতে গিয়ে পিটার জে. বার্টোসীর অভিজ্ঞতা হয় গ্রামগুলো অস্পষ্ট। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীগুলোর সীমানা কিংবা আবাসিক এলাকার যে বৈশিষ্ট্য তিনি ধারণ করতেন তার সাথে তাঁর এথনোগ্রাফিক মাঠকর্মের এলাকার মিল খুঁজে না পাওয়াই হয়ত ছিল এ ধরনের নামকরণের কারণ। কিন্তু বার্টোসির এথনোগ্রাফিতে বসতি স্থাপনের ঐতিহাসিক এথনোগ্রাফিক উপাত্ত আলোচিত হলেও পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জ কিংবা ঐ ঐতিহাসিক উপাত্ত নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতাগুলো পাওয়া যায় না। এতে করে অধ্যাপক হারা'র ক্ষেত্রে স্থানীয়দের অতীত উদাসীনতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেলেও বার্টোসির কাজে আমরা সে সম্পর্কে ধারণা পাই না।

স্বাধীনতার পরবর্তী ১৯৭৪-৭৫ সালের কাছাকাছি সময়ে মাঠকর্ম করেন 'ঝগড়াপুর' এথনোগ্রাফির ইয়েনেকা আরেন্স ও ইওস ফান ব্যুরদেন এবং 'বাংলাদেশ গ্রামাঞ্চল ও শ্রেণি সংগ্রাম' গবেষণার জন্য বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। ঝগড়াপুরের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক উপাত্ত না পাওয়ার আলোচনা আমরা এথনোগ্রাফিতে দেখি। অতীত সম্পর্কে উদাসীনতা এখানেও লক্ষ করা যায়। অনেকক্ষেত্রেই গ্রামবাসীরা তাদের বয়সও সঠিকভাবে বলতে পারেনি। তবে এক্ষেত্রে লেখকদ্বয় তাদের নিজেদের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে একটি বয়স ধরে নিতেন। লেখকদ্বয় বলেন,

> "লোকের বয়স জানা খুব কঠিন। বেশিরভাগ লোকই নিজের বয়স জানে না। তাদের ক্ষেত্রে আমরা মোটামুটি একটা বয়স ধরে নেই" (১৯৮০, পৃ. ২৮)।

কিন্তু তাঁদের হিসেবের মানদণ্ড কি ছিল তা আমরা জানতে পাই না। জাহাঙ্গীর (১৯৭৯) এর গবেষণায় মিরাবো ও নায়পাড়া গ্রামের গ্রামীন অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা হয় এবং এই গ্রাম দুটোর গ্রামীন অর্থনীতির ঐতিহাসিক পরিবর্তন তুলে ধরেন। কিন্তু পদ্ধতিগত দিক থেকে ঐ ঐতিহাসিক উপাত্ত সংগ্রহের চ্যালেঞ্জের ধরন কেমন ছিল কিংবা তাঁর অভিজ্ঞতা আমরা গবেষণা গ্রন্থটিতে পাই না।

১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮০ সাল সময়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ এথনোগ্রাফিক মাঠকর্ম সম্পন্ন হয়। এরিক জি. জানসেন এর 'গ্রামীণ বাংলাদেশ: সীমিত সম্পদের প্রতিযোগিতা', হেলাল উদ্দিন খান আরেফিন এর 'শিমুলিয়া' ও ভেলাম ভান সেন্দেলের 'গ্রামীণ বাংলাদেশে কৃষক গতিশীলতা'। এই তিনটি এথনোগ্রাফিতে এথনোগ্রাফিক ঐতিহাসিক উপাত্তের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা লক্ষ করা গেলেও এথনোগ্রাফিক ঐতিহাসিক উপাত্ত সংগ্রহের অভিজ্ঞতাগুলো খুব একটা আলোচিত হয়নি। যেমন জানসেন তাঁর এথনোগ্রাফিতে জীবন ইতিহাস (life history) এর আলোকে ঐতিহাসিক রূপান্তরকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই জীবন ইতিহাস সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা আমরা তাঁর এথনোগ্রাফিতে খুঁজে পাই না। একইভাবে আরেফিন গ্রামের ইতিহাস জানার জন্য আনুষ্ঠানিক সাক্ষাতকার (আরেফিন, পৃ. ৯) এর কথা বলেন। কিন্তু তিনি শিমুলিয়ার ইতিহাস সম্পর্কে খুবই কম তথ্য পেয়েছিলেন (পৃ. ১৯-২০)। তিনি এই গ্রামের প্রথম জনবসতি সম্পর্কে তথ্য না পাওয়া 'দূর্ভাগ্যজনক' বলে মন্তব্য করেন। যদিও তিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র থেকে গ্রামের ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন কিন্তু এথনোগ্রাফিতে গবেষণার এই সীমাবদ্ধতার অভিজ্ঞতা তিনি পরিষ্কার করেন নি।

সেন্দেলের গবেষণা গ্রন্থে তিনটি জেলার যে গ্রামগুলোর কৃষক গতিশীলতা নিয়ে তিনি আলোচনা করেন তার প্রতিটি ক্ষেত্রে গ্রামগুলোর ঐতিহাসিক রূপান্তর গুরুত্বপূর্ণভাবে আলোচিত হয়। তবে তিনিও ঐ ঐতিহাসিক উপাত্ত সংগ্রহের অভিজ্ঞতা আলোচনা করেন নি। যদিও তিনি মনে করেন, এ ধরনের গবেষণায় কেবল গবেষণা অভিজ্ঞতা নিয়েই আলাদা প্রবন্ধ কিংবা গ্রন্থ লেখা যেতে পারে। তাঁর মতে,

> "অধিকাংশ গবেষকই তাদের প্রতিবেদনে মাঠকর্মের একটি বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হন; অভিজ্ঞতার নিছক জটিলতা এবং সংগৃহীত তথ্যকে এ অভিজ্ঞতা যে অসংখ্য পথে চিত্রিত করে তা সংক্ষেপ করার সুযোগ দেয় না। এ কারণে মাঠকর্মের বিবরণ প্রায় ক্ষেত্রে পৃথক প্রবন্ধ বা পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়" (পৃ. ২৯)।

এথনোগ্রাফিক উপাত্তের ঐতিহাসিক সূত্র নিয়ে ১৯৬২-৬৪ সালে অধ্যাপক হারা যে সংকটে পড়েছিলেন তা এখনও বিদ্যমান। অধ্যাপক হারা পরবর্তী যে কয়েকজন এথনোগ্রাফার ঐতিহাসিক উপাত্তের সূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন তাদের সবার ক্ষেত্রে 'অতীত' এর তথ্য না পাওয়ার হতাশা লক্ষ করা যায়। এ প্রেক্ষাপটে সমকালীন এথনোগ্রাফারদের পদ্ধতিগত অবস্থান নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে।

অধ্যায় ৩- পেশা

অধ্যাপক হারা তাঁর এথনোগ্রাফির তৃতীয় অধ্যায়ে গহীরার মানুষজনের পেশা নিয়ে আলোচনা করেন। স্থানীয়দের পেশাগত আলোচনায় অধ্যাপক হারা দেখান যে, এ গ্রামের মানুষ তাদের জীবনের বিভিন্ন সময় পেশার পরিবর্তন করে। তবে তিনি দেখান যে, পেশার এই পরিবর্তনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তির পছন্দের কারণেই পেশার পরিবর্তন হতো। তাঁর আলোচনায় দেখা যায় এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে পূর্ব পুরুষের পেশা ধরে রাখার প্রবণতা খুব কম।

এই এথনোগ্রাফি থেকে আমরা পাই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে চট্টগ্রামের রাউজানের গহীরা অঞ্চলের অধিবাসীরা বিশেষভাবে মুসলিম অধিবাসীরা সরকারি অফিসে কিংবা বড় বড় কোম্পানিতে কেরানির কাজের সুযোগ খুবই কম পেত। ঐ সময় এ অঞ্চলের অনেকে বার্মায় গিয়ে নিম্ন আয়ের শ্রমিক হিসেবে কাজ করত কিংবা ছোট ব্যবসা করত। অধ্যাপক হারার মাঠকর্মের সময় গ্রামের

চল্লিশোর্ধ বেশিরভাগ পুরুষের বার্মায় গিয়ে কাজের অভিজ্ঞতা ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। বার্মার শ্রমিক অভিবাসন বিষয়ক ১৯৬২-৬৪ সালের প্রেক্ষাপটের যে আলোচনা অধ্যাপক হারা এখানে তুলে ধরেন তা সমসাময়িক সময়ে বার্মার অভিবাসন বিষয়ক বির্তকের জন্য শক্তিশালী উপাত্ত হিসেবে কাজ করতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চট্টগ্রাম বন্দরকে ঘিরে এ অঞ্চলে নতুন কর্মসংস্থান হয়। অধ্যাপক হারা তাঁর এথনোগ্রাফিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন, দেশভাগ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রভাব পর্যালোচনা করে দেখান যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক মানুষের মত গহীরা গ্রামের মানুষজনের পেশাগত পরিবর্তনের নতুন সম্ভবনা তৈরি করে। পেশাগত পরিবর্তনকে ঘিরে এই অঞ্চলের মানুষের শহর কেন্দ্রিক অভিবাসনের নতুন মাত্রাও দেখা যেত। এ কারণে পেশাগত পরিবর্তন ও অভিবাসনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বুঝতে এ অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

চট্টগ্রাম বন্দর কেন্দ্রিক কাজের সুযোগ থাকলেও ঐ সময়ে কৃষিকাজই প্রধান অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে বিবেচিত হতো। একারণে এ অধ্যায়ে কৃষিকাজ বিষয়ক আলোচনায় ভূমির মালিকানা ও কৃষিজ জমির ব্যবস্থাপনার উপর বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ করা যায়। তবে একটি এথনোগ্রাফিতে সংখ্যাগত উপাত্ত এবং মানচিত্রের ব্যবহার যে গুরুত্ব রাখতে পারে তা এই অধ্যায়ে সবচেয়ে বেশি করে বোঝা যায়। কৃষিজমির মালিকানা নিয়ে অধ্যাপক হারা যে সংখ্যাগত উপাত্ত (quantitative data) ও মানচিত্রের ব্যবহার দেখিয়েছেন তা থেকে সাম্প্রতিক সময়ের এথনোগ্রাফাররা উপকৃত হতে পারেন বলে আমরা মনে করি। এনথোগ্রাফিতে সংখ্যাগত উপাত্তের ব্যবহার পাঠকের কাছে এথনোগ্রাফিক বর্ণনাকে যে আরো অর্থপূর্ণ করতে পারে তা এই অধ্যায় থেকে আমরা দেখতে পারি। ভূমির ব্যবহারের উপর এথনোগ্রাফিক (Land use ethnography) গবেষণার জন্য অধ্যাপক হারার এ অধ্যায়ের আলোচনা সাম্প্রতিক সময়েও খুবই প্রাসঙ্গিক।

অধ্যায় ৪- অঞ্চলভিত্তিক জনগোষ্ঠী

এ অধ্যায়ে গহীরা গ্রামের বসতির ধরন নিয়ে এথনোগ্রাফিক বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ এথনোগ্রাফি থেকে আমরা দেখি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বসতি হলো নিশ্চিত গুচ্ছভিত্তিক বাড়ি যেখানে ৫ থেকে ৩০টি ঘরের মতো থাকত। প্রায় ক্ষেত্রেই গুচ্ছগুলো একজন পিতৃপুরুষের বংশধর হিসেবে গড়ে উঠত, তবে অনেক গুচ্ছ দেখা যেত যেখানে দুই বা তিনজনের বংশধররা থাকত। গুচ্ছভিত্তিক বসতির জন্য অনেকগুলো কারণ ছিল: যার মধ্যে রয়েছে উত্তরাধিকার আইন, ডাকাতি ও ধর্ষণ থেকে বাঁচার নিরাপত্তার জন্য, বাস্তুসংস্থানের অবস্থা এবং জমি বিনিময়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার সূত্রে পাওয়া অধিকার। গুচ্ছভিত্তিক বসতির কারণ অনুসন্ধানের পাশাপাশি এ এথনোগ্রাফিতে বসতির নাম ও বসতির কার্যক্রম বিষয়ক আলোচনা রয়েছে।

বসতির নামের ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রত্যেক বসতির একজন স্থাপতি ছিল যাকে সাধারণত মূল পিতৃতান্ত্রিক গোত্রের একজন পূর্ব পুরুষ হিসেবে বিবেচনা করে বসতির নামকরণ হয়ে থাকত। পরবর্তিতে স্থপতির পদবি ও পেশা অনুসারে নামকরণ করা হতো। একক হিসেবে বসতির কার্যক্রম আলোচনায় দেখা যায়: যখনই কোন কাজ হয় তখন অধিকাংশ কাজগুলো ধর্মীয় ও বসতির শান্তির বিষয়গুলো সাথে সম্পর্কিত হতো। এ এথনোগ্রাফিতে দেখা যায়, অনানুষ্ঠানিকভাবে গ্রামের নানা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে বসতিগুলোকে একটি একক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। যেমন বসতিগুলোর বয়স্ক ব্যক্তিদের সহযোগিতায় পরিদর্শক কর্মকর্তাদের মাধ্যমে শুমারি এবং অন্যান্য জরিপের কাজ করা হতো।

অধ্যায় ৫- বিয়ে

এ এথনোগ্রাফিতে মুসলিম বিয়ে সংক্রান্ত আলোচনা বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে অধ্যাপক হারা শুরুতে বিয়ের বয়স, বাল্য বিয়ের ধারণা, বিয়ের সাথে যৌনতা, যৌন বিষয়ক জ্ঞানার্জনের উৎস, পারিবারিকভাবে আয়োজন করে বিয়ে, ভালবেসে বিয়ের ধরন, বিয়ের জন্য উপযুক্ত সঙ্গী খোঁজার প্রক্রিয়া, বিয়ের আলোচনার বিষয়বস্তু ও ধরন, পুনঃবিবাহ ও বহুবিবাহ, বিয়ের অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্ব বিভিন্ন কেইসের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেন। একইসাথে তিনি বিয়ের অনুষ্ঠানে কী ধরনের দরকষাকষি হতো এবং বিয়ের দুপক্ষের সমবয়সীদের মধ্যে কিভাবে ঠাট্টার সম্পর্ক তৈরি হতো সেসকল বিষয়ও তুলে ধরেন।

এই অধ্যায়ের শুরুতে অধ্যাপক হারা যৌন জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেন, যেখানে তিনি বলেন যে প্রথম বিয়ের সময় ছেলেদের মধ্যে যৌনতা বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকত যা তারা তাদের বড় ভাইয়ের স্ত্রী, বড় বোনের স্বামী ও সম-বয়সীদের কাছ থেকে জানত। অন্যদিকে বেশিরভাগ মেয়ের কোন ধরনের যৌন জ্ঞান ছাড়াই বিয়ে হতো। তাঁর এই ধরনের বর্ণনার সাথে বর্তমান সময়ের অবস্থা টি অনুধাবন করা যায়। যৌনতা বিষয়ে সাংস্কৃতিকভাবে এ অঞ্চলের মানুষ যেভাবে জ্ঞান অর্জন করে তা এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়। একইভাবে বর্তমানে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ককে যেভাবে অনুৎসাহিত করা হয় তার উদাহরণও এই এথনোগ্রাফিতে দেখা যায়।

বিয়ের বয়সের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল বলে তিনি মনে করেন। সাধারণত ১৮-১৯ বয়সে ছেলেদেরকে প্রাপ্ত-বয়স্ক হিসেবে ধরা হতো, তবে একজন ছেলে তখনই বিয়ের জন্য উপযুক্ত হতো যখন সে তার নিজের পরিবারের ব্যয় পরিচালনা করার মতো সক্ষম হতো। কারণ বিয়ের পর একজন ছেলের দায়িত্ব হচ্ছে তার স্ত্রী ও সন্তানদের ভরন-পোষনের ব্যয় নির্বাহ করা। তবে ছেলের বিয়ের ক্ষেত্রে তার জন্মের ক্রম গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রথম এবং একমাত্র ছেলের বিয়ে পরিবারের অন্যান্য ছোট ছেলের তুলনায় তাড়াতাড়ি হতো। এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রথম ছেলের বিয়ের সময় বাবার আয়ের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে বিয়ের ব্যয় নির্বাহের বিষয়টি বাবা দেখাশুনা করত, অন্যদিকে অন্যান্য ছেলের বিয়ের সময় বাবার অর্থনৈতিক অবস্থা আস্তে আস্তে নিম্নমুখী থাকত যার কারণে অন্যান্য ছেলেদের বিয়ের খরচ বাবা বহন করতে পারত না। অন্যদিকে একজন মেয়ের বিয়ের বয়সকে তার মাসিক শুরু হওয়ার সাথে যুক্ত করে দেখা হতো। যদি কোন মেয়ের বিয়ে তার প্রথম মাসিকের আগে হয় তাহলে তাকে বাল্যবিবাহ বলে গণ্য করা হতো। তিনি শিকদার বাড়ির বিয়ের বয়সের একটি পরিসংখ্যানিক তথ্য হাজির করে দেখান যে, মেয়েদের প্রথম বিয়ের গড় বয়স হলো ১৩ বছর, সেখানে একজন ছেলের প্রথম বিয়ের বয়স ২২ বছর (হারা ১৯৯১; পৃ. ৭৪, ছক ২১ ও ২২)। অন্যদিকে বিয়ের সময় স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার ব্যবধান বেশি হওয়ার কারণ হিসেবে তিনি দুইটি চলক যথাক্রমে, ছেলের অর্থনৈতিক অবস্থা ও ধর্মীয় মতাদর্শের কথা উল্লেখ করেন। অর্থনৈতিকভাবে একজন পুরুষ সক্ষম হতে অনেক বেশি সময় নিত, যে কারণে পুরুষের বিয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি বয়সে হতো, অন্যদিকে ধর্মীয় মতাদর্শ ও সতীত্বের ধারণা মেয়েকে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিয়ে দিতে বাধ্য করত।

এ এথনোগ্রাফি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, গহীরায় ১৯৬২-৬৪ সালে ভালবেসে ও পারিবারিকভাবে আয়োজিত উভয় ধরনের বিয়ের প্রচলন ছিল। পছন্দ করে বিয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত কনের বাবা-মা বিষয়টি সহজেই মেনে নিত না। আবার কোন কনে বা ছেলের যদি অন্যত্র বিয়ে হতো এবং তার যদি কোন ভালবাসার সম্পর্ক থেকে থাকলে এবং তা প্রকাশিত হয়ে থাকলে তা তাদের বাবা-মা'র কাছে সম্মানহানিকর ব্যাপার হিসেবে দেখা হতো। তিনি বলেন, তাত্ত্বিকভাবে

বিয়ের সিদ্ধান্ত ছেলে ও মেয়ের ব্যক্তিগত। তবে সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কনে পক্ষ ও বর পক্ষ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে, এ বিষয়ে অধ্যাপক হারা বলেন,

> "বিয়ের আয়োজন হয়ে থাকে পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে। বিয়ের বিষয়ে শুধুমাত্র ছেলে, মেয়ে এবং তাদের বাবা-মা সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যদিও পরিবারের বাইরের অনেকে বিয়েতে পরিবারকে সাহায্য করে, তারা বিয়ের মূল বিষয়ে, যেমনঃ কাকে বিয়ে করবে বা কোন কোন শর্তের আলোকে বিয়ে হবে, সে বিষয়ে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তারা বিয়ে বন্ধ করতে পারে না। তারা শুধুমাত্র বিয়ের অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থেকে কোন বিষয়ে তাদের অসন্তুষ্টি জানাতে পারে (হারা ১৯৯১; পৃ. ৭৫)।"

বিয়ের সাথে যৌনতার বিষয়টি যে আলাদা নয় তা অধ্যাপক হারার এই এথনোগ্রাফি থেকে বোঝা যায়। তিনি এই এথনোগ্রাফিতে দেখিয়েছেন যে, বিয়ের মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন 'বৈধ' হতো। ঠিক এ কারণে পুরুষের জন্য স্ত্রী নির্বাচনের সময় কনে কি ধরনের কাজ করতে পারত বা তার শিক্ষাগত যোগ্যতা বা অন্যান্য গুনের চেয়ে মেয়ের শারীরিক সৌন্দর্য, মুখের গঠন, শারীরিক গড়ন ও গায়ের রং গুরুত্ব পেত। অন্যদিকে স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভাল অর্থনৈতিক অবস্থা ও যৌনভাবে শক্তিশালী পুরুষকে কনে পক্ষ বেশি গুরুত্ব দিত। এক্ষেত্রে সম্পত্তির পরিমাণ নয় বরং ছেলের আয়ের পরিমাণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে উভয় ক্ষেত্রে গ্রামের মুরুব্বীরা ছেলে বা মেয়ের গোষ্ঠী বা বংশের গুরুত্বের কথা বার বার উল্লেখ করলেও অধ্যাপক হারা মনে করেন এক্ষেত্রে বংশগতভাবে অর্জিত গুণের চেয়ে অর্থনৈতিক অবস্থাটিকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হতো যা সমসাময়িক বাংলাদেশের বিয়ে ব্যবস্থায়ও এই ধরনের চর্চা দেখা যায়।

বিয়ের ক্ষেত্রে ভৌগলিক দূরত্বের বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম না থাকলেও অধ্যাপক হারা দেখান যে, সঙ্গী খোঁজার সময় কনে বা ছেলের মূল পরিবারের ভৌগলিক অবস্থানের বিষয়ে এক ধরনের গুরুত্ব দেয়া হতো। ভাল যাতায়াত ব্যবস্থা ও বিয়ের পর যেন ভাল যোগাযোগ বজায় থাকে সেজন্য তুলনামূলক কাছের কোন গ্রামে বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা ছেলে ও কনে পক্ষের উভয়েরই ক্ষেত্রে লক্ষ করা যেত। একটি পরিসংখ্যানিক তথ্য উপস্থাপন করে তিনি দেখান যে, মেয়ে বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা ১.৫ মাইল ব্যাসার্ধের এলাকাকে বেশি প্রধান্য দিত। বিয়ের পর কোন সমস্যা হলে যেন স্ত্রীর মূল পরিবারের কেউ খুব দ্রুত আসতে পারে সেজন্য এই ধরনের প্রবণতা কনে পক্ষের ক্ষেত্রে দেখা যেত। ভালভাবে তথ্য সংগ্রহের সুবিধার কথা মাথায় রেখে প্রথম ছেলের বিয়ের ক্ষেত্রে বাবা-মা সাধারণত কাছের এলাকাকে বেশি প্রাধান্য দিত। কেননা, সাধারণত প্রথম ছেলের স্ত্রী ছেলের বাবা-মার সাথেই বসবাস করত। বিয়ের ক্ষেত্রে জ্ঞাতিসম্পর্কের কোন ছেলে বা মেয়েকে বেশি প্রাধান্য দিত। শিকদার বাড়ির স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিয়ের পূর্বের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে তিনি দেখান যে, একই গোষ্ঠীর মধ্যকার আন্ত বিবাহের সংখ্যা কম নয়, তবে অর্থনৈতিক কারণ এখানে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> "কাছের জ্ঞাতিরা একে অপরকে জানার ক্ষেত্রে বেশি সুবিধা থাকে এবং বাছাই করার ক্ষেত্রে তথ্য বেশি পায়। তবে এটা হতে পারে যে একজন সম্পর্কহীন প্রতিবেশী সম্পর্কে যতটুকু জানবে, তদ্রুপ একজন গোষ্ঠীর সম্পর্কেও ততটুকুই জেনে থাকবে। আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এখানে এমন একটি ঘটনা আছে যেখানে একটি ছেলে তার বাবার ভাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব এসেছিল কিন্তু ছেলেটি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং দক্ষিণ ভারতের মাইশরি থেকে আসা এক ধনী অভিবাসী ব্যক্তির মেয়েকে বিয়ে করে (হারা ১৯৯১; পৃ. ৮১)।"

সাধারণত নারীরাই কনে সম্পর্কে অনুসন্ধান করত, কারণ পর্দা প্রথা কঠোরভাবে চর্চা করা হয় বলে পুরুষরা একাজের জন্য অন্যের বাড়িতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারত না। তাছাড়া দুর্বল যাতায়াত ব্যবস্থা, দীর্ঘ সময়ে বাবা'র অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণে বিয়েতে মধ্যস্থতাকারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। মধ্যস্থতাকারীর কাজ ছিল দুই পরিবারের মধ্যে যে যোগাযোগহীনতা থাকত তা দুর করা। তাছাড়া বিয়েতে ছেলে ও কনে পক্ষের মধ্যকার প্রতিযোগিতার কারণে এক ধরনের অচলাবস্থা তৈরি হতো। এই সকল কারণে অনেক সময় বিয়ে ভেঙ্গে যেতে পারত। এই সকল ক্ষেত্রে একজন মধ্যস্থতাকারী দুই পক্ষের মধ্যকার দরকষাকষির মাধ্যম হতো। এই ধরনের ব্যক্তি সাধারণত ছেলে বা মেয়ের পক্ষের আত্মীয় যিনি বিয়েতে কোন পুরস্কারও পায় না বরং সে সুনামের জন্য এই কাজটি করত।

অধ্যাপক হারার পর্যবেক্ষণে ঐ অঞ্চলের বিয়ের অনুষ্ঠানের পাঁচটি ভাগ ছিল: ক) বাগদান অনুষ্ঠানের আয়োজনের প্রস্তুতির জন্য আলোচনা (পানচেল্লা), খ) বাগদান (জোড়া), গ) বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিমূলক আলোচনা (পানচেল্লা), ঘ) বিয়ের অনুষ্ঠান এবং ঙ) বাবা-মা'র পরিবারে কনের বেড়াতে যাওয়া। অধ্যাপক হারা বিয়ের অনুষ্ঠানের এই ধাপগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেন। তিনি দেখান যে, পানচেল্লার অনুষ্ঠানগুলো দুই পক্ষেরই হতো যা সাধারণত বসতির অন্যান্য মানুষের সাথে প্রস্তুতিমূলক আলোচনা। পানচেল্লা অনুষ্ঠানের বয়ানে আমরা দেখতে পাই যে, সামাজিক একটি অনুষ্ঠান হিসেবে 'বিয়ে' বসতির সবার মধ্যে এক ধরনের একতা তৈরি করত। পানচেল্লার পর বরের বাড়ির লোকজন ভালো পোষাক পরিধান করে কনের বাড়িতে যেত বাগদানের বা জোড়া'র জন্য। বাগদান অনুষ্ঠানটি অনেকটা বিয়ে সম্পন্ন করার মৌখিক প্রতিশ্রুতি। এরপর শুরু হতো বিয়ের অনুষ্ঠানের আলোচনা যেখানে কনে ও বর পক্ষ নিজেদের বসতিতে বিয়ের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করত। এই আলোচনার পর বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হতো। বিয়ের অনুষ্ঠানকে দেখা হতো সামাজিকভাবে একত্র হওয়ার একটি সুযোগ হিসেবে যেখানে একই জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সদস্যরা একসাথে জড়ো হতো, ফলে বিয়ের অনুষ্ঠানটি এমন সময় আয়োজন করা হতো যেন সবাই উপস্থিত থাকতে পারত। বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে কিছু আনুষ্ঠানিকতা থাকত যেখানে বরের গোসল করা থেকে শুরু করে, পোশাক পরিবর্তন, বরের জন্য উপহার দেওয়া, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বরের যাত্রা ইত্যাদি। অন্যদিকে খাবার প্রস্তুত করা ও কনেকে সাজানোর পাশাপাশি বিয়ের আসরে প্রবেশের পূর্বে বরকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাধা দেওয়ার কাজ করত কনে পক্ষ। এখানে দুই পক্ষের মধ্যে একধরনের ঠাট্টার সম্পর্ক লক্ষ করা হতো। এখানে বিভিন্ন বিষয়ে দুই পক্ষের মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে নাটকীয় বিরোধ তৈরি হতো। এই সময়টি দুই পক্ষের জন্য খুই উদ্বেগের কেননা এ সময় বর পক্ষ থেকে দেওয়া উপহারগুলোর মান ও গুণ কনে পক্ষ অনুসন্ধান করত। অনুসন্ধানে যদি কোন সমস্যা ধরা পড়ত তাহলে বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকত। তারপর বিয়ের সামাজিক ও ধর্মীয় আচার শুরু হতো। একজন মৌলভী প্রথমে কনের মতামত নিতেন এবং তারপর ছেলে মতামত নিয়ে বিয়ের দলিলে স্বাক্ষর করতেন। বিয়ে যে একটি সামাজিক চুক্তি তার প্রতিফলন ঘটে এই দলিলে। এখানে বিয়ের শর্ত, দেনমোহরের পরিমাণ, অপরিশোধিত অংশের পরিমাণসহ আরো অন্যান্য শর্তের পাশাপাশি বর, কনে ও স্বাক্ষীদের নামসহ অন্যান্য বিবরণ থাকত। যদি কোন কারণে তাদের বিয়ে বিচ্ছেদ হতো তাহলে এই দলিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। তারপর বিশেষ ভোজের মাধ্যমে সকল ধরনের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দূর হতো। ভোজের পর স্ত্রী'কে নিয়ে স্বামী তার বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করত। সেখানেও একধরনের রীতি মেনে স্ত্রী'কে বরণ করা হতো।

১৯৬২-৬৪ সালে বিয়ের রীতির যে বিস্তারিত পাই তার সাথে সাম্প্রতিক বিয়ের রীতির পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে বিয়ের অনুশীলনের পরিবর্তনগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে বিয়ের রীতিকে ঘিরে

যে ঐতিহ্য আমাদের রয়েছে তার বর্তমান স্বরূপ কী সেটিও বোঝা যাবে। সমসাময়িক বাংলাদেশে বিয়ের অনুশীলন, চর্চা, বিয়ের মাধ্যমে যৌনতা বৈধ করার যে সাংস্কৃতিক রীতি এবং বিয়েকে সামাজিক চুক্তি হিসেবে বিবেচনা করার যে পটভূমি রয়েছে তা বোঝার জন্য এই অধ্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশে বিয়ের চর্চার যে ধরন রয়েছে তা বুঝতে তাঁর এই অংশগ্রহণমূলক পর্যালোচনা ভবিষ্যত অনুসন্ধানের জন্য গুরুত্ব বহন করবে বলে আমরা মনে করছি।

অধ্যায় ৬- পরিবার

অধ্যায় ৬- এ অধ্যাপক হারা পরিবারের সংজ্ঞার পাশাপাশি একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক, পরিবারের বিকাশের প্রক্রিয়া, পরিবারে নারী-পুরুষের জীবন এবং একটি সামাজিক দল হিসেবে পরিবার কী ধরনের ভূমিকা পালন করে তা এথনোগ্রাফিক কাজের আলোকে বর্ণনা করেন।

এ অধ্যায়ের শুরুতেই তিনি পরিবারকে সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে,

> "পরিবারকে এমন একটি গুচ্ছ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, যেখানে আত্মীয়রা রান্নার জন্য একই চুলা ব্যবহার করে। একটি পরিবারের মূল একক হচ্ছে এখানে একজন স্বামী, তার স্ত্রী এবং তাদের অবিবাহিত সন্তান। স্বামীর দায়িত্ব হলো স্ত্রী ও সন্তানদের দেখাশুনা করা (হারা, ১৯৯১; পৃ.১১২)।"

অধ্যাপক হারার মতে, পরিবারে স্বামীর দায়িত্ব হলো কারোর উপর নির্ভরশীল না হয়ে স্ত্রী ও অবিবাহিত সন্তানদের দেখা-শুনা করা। তার এই দায়িত্ব মৃত্যুর আগ পর্যন্ত একপাক্ষিকভাবে চলমান থাকে। যদি কোন অবিবাহিত সন্তান আয় করে তাহলেও এই দায়িত্ব স্বামীর উপর ছিল। এক্ষেত্রে অবিবাহিত সন্তানের দিক থেকে পরিবারে অর্থনৈতিক কোন অবদান রাখার বাধ্যবাধকতা থাকত না। তবে ছেলে বিবাহিত হলে তার পরিবারের দায়িত্ব তার বাবা বহন করত না। আর এভাবেই অন্য আরেকটি পরিবারের বিকাশ ঘটে বলে তিনি মনে করেন। অধ্যাপক হারার এথনোগ্রাফিক কাজ থেকে আমরা দেখি যে, বড় পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে পরিবারে আয় করা সদস্যরা অর্থনৈতিকভাবে কতটুকু অবদান রাখবে তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করত। পরিবারে সম্পত্তির বিভাজন বাবার জীবদ্দশায় সাধারণত হতো না। তবে বাবার মৃত্যুর পর পর মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী সম্পদের বিভাজন হতো যেখানে বাবার মৃত্যুর পর তাঁর ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে) ও শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের খরচ বাদ দিয়ে বাকি অংশ বণ্টন হতো। অধ্যাপক হারার মতে, এ কারণে অর্থনৈতিক দিক থেকে মুসলিম পরিবারে স্থায়ী কোন কাঠামো থাকে না। ব্যক্তি মালিকানার ধারণার কারণে পূর্ব প্রজন্মের সম্পত্তি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরের ধারণাটি তার গবেষণা এলাকায় অনুপস্থিত ছিল। এই নির্ণায়কগুলো পরিবারের বিভাজনে উৎসাহ দিত।

পরিবারের বিকাশ বুঝতে গিয়ে অধ্যাপক হারা পরিবারের জনসংখ্যা তত্ত্ব বোঝার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন, যেখানে পুরুষের প্রথম বিয়ের সময় স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান, দ্বিতীয় বিয়ের সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বয়সের ব্যবধান, বড় ও সবচেয়ে ছোট ছেলের মধ্যকার বয়সের ব্যবধান, বাবা ও বড় ছেলের মধ্যকার বয়সের ব্যবধান, বাবা ও ছোট ছেলের মধ্যকার বয়সের ব্যবধান গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করত। তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতার কারণে এই বিষয়গুলো পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি করে, ফলে পরিবারের বিভাজন ত্বরান্বিত হয়ে যেত। পরিবারে সৎ ভাই থাকলে এই দ্বন্দ্ব আরো প্রকট হতো। এই ধরনের বিভাজন পরিবারকে

অর্থনৈতিকভাবে ভঙ্গুর করত। পরিবারের মধ্যকার এই ধরনের জনসংখ্যা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পরিবারের বিকাশ বুঝতে সহায়তা করে।

পরিবারের এই সকল বৈশিষ্ট্যের আলোকে অধ্যাপক হারা মনে করেন, একটি সামাজিক দল হিসেবে পরিবার খুব দুর্বলভাবে গঠিত ও বিকশিত হতো। তাঁর মতে,

> "পরিবারের মূল কাঠামো একজন পুরুষ, তার স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের নিয়ে গঠিত। তবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে একটি পরিবার উপরে উল্লেখিত মূল একক হিসেবে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে নুতুনভাবে পুনরায় গঠিত হয়, গঠনের এই প্রক্রিয়াটি বৃত্তাকারভাবে চলতে থাকে (হারা, ১৯৯১; পৃ. ১৩৬)।"

এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের কারণে দল হিসেবে পরিবার কখনোই শক্তিশালী হতো না বরং দলীয় স্বার্থের বাইরে এটা ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিত, সমতার ধারণার কারণে পরিবার অবস্থানকে অনেক অস্থিতিশীল করে এবং 'ব্যক্তিগত ভাগ্য' ধারণাটি দল হিসেবে পরিবারের সংহতিতে ফাটল ধরাতো। অধ্যাপক হারা এই বিষয়গুলোর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হাজির করেছেন যা সমসাময়িক সময়ে একক পরিবার গঠন ও বিকাশ অধ্যয়নে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিবে।

এ অধ্যায়ে তিনি পরিবারে একজন ছেলে ও কন্যা শিশুর জীবন তুলনামূলক আলোচনা করে বলেন যে, পরিবারে একজন ছেলে শিশু মেয়ে শিশুর তুলনায় অনেক স্বাধীনতা পেত। ছেলে শিশুরা চাইলেই বাইরে গিয়ে খেলতে পারত যেখানে কন্যা শিশুরা ঘরের বিভিন্ন কাজের মা'কে সহায়তা করত। ঘরের কাজে ছেলেদের কোন দায়িত্ব থাকত না। শিশুকাল থেকেই মেয়েদেরকে পর্দা করার বিষয়ে ধারণা দেওয়া হতো। আর এই ধরনের শিক্ষা ও চর্চার কারণে মেয়েদের চলাচল সীমিত হতো অন্যদিকে ছেলে শিশুরা বাইরে যাওয়ার অবাধ সুবিধা পেত। অধ্যাপক হারার এই আলোচনা থেকে নারীত্ব বা পুরুষত্ব তৈরির প্রক্রিয়াটি খুব সহজেই অনুমান করা যায় যা লিঙ্গীয় বিষয়াবলি অধ্যয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করবে।

এ অধ্যায়ে তিনি গহীরা গ্রামের পরিবারের গঠন, বিকাশ ও একটি ভঙ্গুর প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার গড়ে ওঠার কারণ বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে যে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও উপাত্ত (হারা ১৯৯১, ছক ৩৮-৪৪, পৃ. ১১৭-১২০) হাজির করেছেন তা পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে অধ্যাপক হারার পরবর্তী অন্য এথনোগ্রাফিতে পাওয়া যায় না। তিনি দেখান, কীভাবে পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বয়সের পার্থক্য, বড় ছেলে ও বাবার মধ্যকার বয়সের পার্থক্য, বড় ছেলে ও সবচেয়ে ছোট ছেলের বয়সের পার্থক্য, জীবিত-বিবাহিত নারীর সংখ্যা ও তাদের সন্তানের সংখ্যা পরিবারের ভাঙ্গন দ্রুততর করে। পরিসংখ্যানিক এই নির্ণায়কগুলোর পাশাপাশি তিনি গুণগত নির্ণায়ক যেমন ধর্মীয় মতাদর্শের কথাও উল্লেখ করেন যা এ সংক্রান্ত আলোচনায় পূর্ণতা পায়।

অধ্যায় ৭- জ্ঞাতিসম্পর্ক

এই অধ্যায়ের শুরুতে অধ্যাপক হারা জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলির বৈচিত্র্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি তিনি বিয়ের মাধ্যমে অর্জিত ও রক্তের সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত জ্ঞাতিসম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। জ্ঞাতিসম্পর্কের পদাবলির বৈশিষ্ট্য হিসেবে তিনি বলেন যে, গ্রামবাসীরা লিঙ্গ নিরপেক্ষ পদ ব্যবহারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিত। আন্ত-বিবাহের প্রচলনের কারণে জ্ঞাতিসম্পর্কের পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা দেখা যেত। 'কাছের', 'দূরের' জ্ঞাতি চিহ্নিত করার মাধ্যমে গ্রামবাসী এই জটিলতা দূর করার চেষ্টা করত বলে অধ্যাপক হারা তার এথনোগ্রাফিতে উল্লেখ করেন। আবার বাবার বা মায়ের দিকের জ্ঞাতি হিসেবে চিহ্নিত করত।

অধ্যাপক হারার মতে, মায়ের দিকের তুলনায় বাবার দিকের জ্ঞাতিদেরকে কাছের হিসেবে বিবেচনা করা হতো কারণ তারা একই জ্ঞাতি দল বা গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। আবার আন্তবি-বাহের কারণে জ্ঞাতি সম্পর্কের পদ ব্যবহারের জটিলতা দূর করার জন্য বিয়ের আগের পদগুলো তারা ব্যবহার করত। তবে পদ ব্যবহার করতে গিয়ে যদি কোন অসামঞ্জস্যতা দেখা দিত তাহলে ইগোর অবস্থানের তুলনায় বয়সকে বেশি প্রাধ্যান্য দিত, উদাহরণ হিসেবে বাবার ছোট ভাইয়ের বয়স যদি কম হতো তাহলে তারা একে অপরকে চাচা বলে সম্বোধন করত। অধ্যাপক হারার মতে, এই পদ্ধতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বিয়ের মাধ্যমে জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার করা হতো। পদাবলি ব্যবহারের বিভক্তি বিবাহের মাধ্যমে অর্জিত আত্মীয়দের মধ্যকার সম্পর্কের গভীরতা ও গুরুত্বকে ইঙ্গিত করে।

জ্ঞাতিসম্পর্ক অধ্যয়ন করতে গিয়ে অধ্যাপক হারা কিছু বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো পদ ব্যবহারের নমনীয়তা এবং এক্ষেত্রে বয়স জ্ঞাতিসম্পর্কের অবস্থানকে ছাড়িয়ে যায়। রক্তের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাবার দিকের আত্মীয়দেরকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে একজন ব্যক্তির পরিচয় পেত বাবার মাধ্যমে। বাবার সাথে সম্পর্কীত আত্মীয়দেরকে ডাকার ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির সাথে বাবার সম্পর্কটি গুরুত্ব দেওয়া হতো। এক্ষেত্রে 'গোষ্ঠী' প্রত্যয়টি সামনে আসে। বাবা যে গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত থাকত তার সন্তানরা একই গোষ্ঠীতে অবস্থান করত। অধ্যাপক হারা উল্লেখ করেন, গোষ্ঠী টিকে থাকত পিতৃতান্ত্রিক একটি শ্রেণি হিসেবে। তবে এখানে মেয়েরাও পিতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত। জ্ঞাতিসম্পর্ক অনুসন্ধান করতে যেয়ে অধ্যাপক হারা পর্যবেক্ষণ করেন যে, রক্তের সম্পর্কের প্রতি পুরুষদের অনুভূতি নারীর অনুভূতির তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। কারণ বিয়ে ব্যবস্থার কারণে নারীরা তার বাবার বাড়ি ছেড়ে অন্যের বাড়িতে যেত। এর ফলে ভৌগলিকভাবে একসাথে বসবাস না করলেও গোষ্ঠীর প্রতি নারীর যুক্ততা থাকত।

অন্যদিকে বিয়ের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞাতিসম্পর্ক নিয়ে অধ্যাপক হারা'র পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

> "রক্তের সম্পর্কের মতো নয় বরং বিবাহের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞাতি সম্পর্কের মানুষের সাথে যে আচরণ করা হয় তা অনেক বেশি প্রথাগত। রক্তের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বংশ তালিকায় ব্যক্তির অবস্থানের তুলনায় বয়স অনেক সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেখানে বিবাহের মাধ্যমে অর্জিতজ্ঞাতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে বয়সের চেয়ে বংশগত অবস্থান বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নবদম্পতির ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রী তার স্বামী বা স্ত্রী'র আত্মীয়দের সাথে নতুন জ্ঞাতিসম্পর্কের বাঁধন তৈরি করার জন্য মানসিকভাবে একটি মানচিত্র তৈরি করে । স্বামী বা স্ত্রী'র রক্তের সম্পর্কের মানুষজনকে চিহ্নিত করার জন্য সেকল পদাবলি ব্যবহার করা হয় তখন এই বিষয়টি দেখা যায় যেখানে বয়সের ব্যবধান বিবেচনায় নেওয়া হয় না (হারা ১৯৯১, পৃ ১৪৯)।"

বিয়ের পরে যেসকল পদ ব্যবহার করা হতো তা অনেক বেশি সম্মান প্রদর্শনমূলক। পরবর্তী আলোচনায় তিনি বলেন যে, বিয়ের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞাতি সম্পর্কের মধ্যে আরো দু'টি ধরন ছিল যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক যেখানে ইগো'র সাথে বয়সের পার্থক্য থাকলেও যারা একই প্রজন্মের তাদের সাথে এক ধরনের ঠাট্টার সম্পর্ক থাকত আর এই আত্মীয়রা পুরুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আবার স্বামীর বাড়ির কিছু আত্মীয় যেমন স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী, নারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক হারা'র এই অধ্যায়টি গ্রামের জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যবস্থা বুঝতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেখানে তিনি জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যবস্থার সাথে ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেওয়ার সাথে সম্পর্কিত মূল্যবোধ পদ্ধতি, সম্পত্তির সাথে যুক্ত জ্ঞাতিসম্পর্ক, বসতির বিশেষ ধরন, পর্দাপথা এবং পরিবারের জনসংখ্যা অবস্থা যুক্ত রয়েছে বলে মনে করেন। তাঁর এই আলোচনা জ্ঞাতিসম্পর্ক কাঠামো ও পদ ব্যবহারের পরিবর্তনশীলতা বুঝতে সহায়তা করবে।

অধ্যায় ৮- উপসংহার

উপসংহারে অধ্যাপক হারা এই এথনোগ্রাফির কেন্দ্রীয় বিষয় তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, গ্রামের জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যবস্থা ও পরিবারের মধ্যকার কোন সম্পর্ক আছে কিনা, কিংবা থাকলে এর আদর্শধারা বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের সাথে যুক্ততা তিনি দেখার চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক হারা তাঁর গবেষণাকালীন সময়ের মুসলিম পরিবার বিষয়ক নৃবৈজ্ঞানিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের সাহিত্য পর্যালোচনা করে মুসলিম পরিবার বিষয়ক তাত্ত্বিক সমস্যা চিহ্নিত করেন। তিনি দেখান যে, ঐ সময় 'মুসলিম পরিবার' নিয়ে যারা আলোচনা করেছেন তাঁরা (Gaudefroy-Demombynes, ১৯৫০; Jeffery, ১৯৫৯) 'মুসলিম পরিবার' বোঝাতে সাধারণত দুই ধরনের যুক্তি দেন:

"ক) 'মুসলিম পরিবার' সর্বজনীন হয় এবং এটা বিশ্বের সকল মুসলিম দেশে অঞ্চল ও সংস্কৃতিভেদে একইরূপ থাকে। খ) 'মুসলিম পরিবার' এর সর্বজনীন রূপ 'আরব পরিবার' এর মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা যায় কারণ মুসলিম পরিবারের ধারণা আরব পরিবারের ধারণা থেকে উৎপত্তি হয়েছে (হারা, ১৯৯১; পৃ. ১৫৯)"।

অধ্যাপক হারা 'মুসলিম পরিবার' বিষয়ক Gaudefroy-Demombynes (১৯৫০) ও Jeffery (১৯৫৯) এর দেয়া ধারণাকে ত্রুটিপূর্ণ ধারণা হিসেবে চিহ্নিত করেন। অধ্যাপক হারা মত দেন যে, হাদিস ও মুসলিম আইন মুসলিম অধ্যুষিত সকল এলাকায় কিছু আইনি ও নৈতিক নিয়ম প্রদান করে। এ কারণে তিনি মনে করেন যে স্থানীয়ভাবে পরিবারের উপাদান বিশ্লেষণ ছাড়া পরিবারের ধরন বোঝা সম্ভব নয়। তিনি বলেন,

> "এমন কোন নিশ্চয়তা নেই যে, মোহাম্মদ (সাঃ) বা ইসলাম ধর্মের নেতারা যেভাবে আরব পরিবার গঠন করেছেন তারপর থেকে আরব পরিবারগুলোর পরিবর্তন হয়েছে। সবচেয়ে নিরাপদ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায় আমার কাছে মনে হয় প্রথমত: মুসলিম ধর্মের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক জটিলতা থেকে যৌক্তিকভাবে পরিবার ধারণাকে ছোট করে আনা এবং দ্বিতীয়ত বিভিন্ন এলাকার আধুনিক মুসলিমদের মূল পরিবার বা জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যবস্থার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো আলাদা করা, এবং সর্বোপরি উপরে উল্লেখিত ফলাফল ও যৌক্তিক অবরোহনের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বের করা (হারা, ১৯৯১; পৃ. ১৫৯)"।

অধ্যাপক হারার 'মুসলিম পরিবার' বিষয়ক এই ধারণা ধর্মের স্থানিক রূপ দেখতে উৎসাহিত করে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একটি মুসলিম গ্রামের পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক নিয়ে এথনোগ্রাফি করতে গিয়ে এ কারণে অধ্যাপক হারা দেখিয়েছেন গহীরা গ্রামের অনেক নির্ণায়ক রয়েছে যেগুলোর ফলে পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্কের বিভিন্ন ধরনকে সামনে নিয়ে আসে। যেমন অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবকগুলো এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকের কাজ করতে পারে। একারণে আরব পরিবার ও গহীরা গ্রামের মুসলিম পরিবারের মধ্যে প্রকাশিত ধরনের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য থাকবে।

সমকালীন গ্রামীণ সমাজ অধ্যয়নে অধ্যাপক হারা'র এথনোগ্রাফির প্রাসঙ্গিকতা

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ অধ্যয়ন নিয়ে রচিত এথনোগ্রাফিগুলোর একটিতেও অধ্যাপক হারা'র এই গুরুত্বপূর্ণ এথনোগ্রাফিটিকে রেফার করা হয়নি। আমরা মনে করছি অধ্যাপক হারার এথনোগ্রাফিটি ১৯৬৭ সালে পিএইচডি গবেষণা প্রতিবেদন হিসেবে এবং ১৯৯১ সালে বই আকারে প্রকাশিত হলেও এই এথনোগ্রাফি সম্পর্কে খুব একটা পরিচিতি না থাকার কারণে এটা হয়ে থাকতে পারে। যাই হোক দুইটি দিক থেকে অধ্যাপক হারা'র এই এথনোগ্রাফিটি সমকালীন গ্রামীণ সমাজ অধ্যয়নে প্রাসঙ্গিক বলে আমরা মনে করছি। প্রথমত, এই এথনোগ্রাফিটি পরবর্তী

এথনোগ্রাফারদের কাজের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে। যেমন 'অতীত' নিয়ে অধ্যাপক হারা'র যে সংকট ছিল তা থেকে পরবর্তী এথনোগ্রাফারদের ভাবতে সাহায্য করবে। এছাড়া এথনোগ্রাফিতে গুণগত ও পরিমাণগত উপাত্তের পাশাপাশি মানচিত্রের ব্যবহার ও ব্যাখ্যা পাঠকের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে তার একটি নমুনা আমরা অধ্যাপক হারা'র কাজের মাধ্যমে দেখতে পাই।

দ্বিতীয়ত, অধ্যাপক হারা যে ভৌগলিক এলাকায় তার গবেষণা কাজটি করেছেন সেই এলাকার অবস্থান সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য পাচ্ছি। পাশাপাশি তিনি যে জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করেছেন সেই গহীরার অধিবাসীদের নামগুলোও পাচ্ছি। এর ফলে তাঁর এথনোগ্রাফি একদিকে যেমন এলাকাকে চিহ্নিত করছে তেমনি যে মানুষগুলোর সাথে গবেষণা করেছেন সেই মানুষগুলোর পরিচিতিমূলক তথ্যও আমরা পাচ্ছি। এই অবস্থায় এথনোগ্রাফিতে এথনোগ্রাফিক এলাকার বা মানুষের ছদ্মনামের উপস্থিতি আমরা পর্যবেক্ষণ করি না। অনেক গবেষক যেমন Bernard (2006), Kaiser (2009), Murphy and Dingwall (2001), ছদ্মনাম ব্যবহার করে এলাকা বা গবেষণার অংশগ্রহণকারীদের নামপরিচয় গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় যেন ঐ এলাকা বা এলাকার মানুষরা ভবিষ্যতে কোন ঝুঁকির মুখোমুখি না হয়। কেননা যদি তাদের পরিচয় সবার সামনে চলে আসে তাহলে তারা হয়তো কোন বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন। আবার অনেক সময় এথনোগ্রাফারকে নামপরিচয় দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর গবেষণার অংশগ্রহণকারীরা দেয়না। সেক্ষেত্রে এথনোগ্রাফিতে ছদ্মনাম ব্যবহারের তাগিদ দেওয়া হয়। যদি আমরা অস্পষ্ট গ্রাম, ঝগড়াপুর কিংবা শিমুলিয়ার উদাহরণ দেই তাহলে আমরা দেখি যে, ঐ এথনোগ্রাফিগুলোতে এথনোগ্রাফাররা তাদের গবেষণা এলাকা বা গবেষণাতে অংশগ্রহণকারীর নাম নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করেননি। যদিও তাঁদের এথনোগ্রাফি থেকে গ্রামের স্থান নির্ধারণের চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু অধ্যাপক হারা'র কাজের ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি মূল নাম প্রকাশের বিষয়টি দেখতে পাই। গবেষণা গ্রন্থে গবেষিতের নাম বা পরিচয় প্রকাশ করতে যাঁরা আগ্রহী নয় তাঁদের মতে, পরিচয় প্রকাশ করার বিষয়টি অনেকক্ষেত্রে গবেষিতের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। এই দিক বিবেচনায় অধ্যাপক হারা'র নাম প্রকাশের বিষয়টি হয়তো একভাবে সমস্যাজনক বা কোন কোন সমালোচক হয়তো মনে করতে পারেন যে, অধ্যাপক হারা যে এলাকা বা মানুষজনের সাথে গবেষণা করেছেন তাদের নাম বা পরিচয় প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাদেরকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। তিনি এখানে যেভাবে সংবেদনশীল বিষয় যেমন, যৌনতা, বিয়ের আলোচনা, বহুবিবাহ বা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন তা হয়তো সমস্যা হতে পারে। এখানে আমরা আশা করছি অধ্যাপক হারা তাঁর তথ্যদাতাদের অনুমতি ক্রমে তাদের নামপরিচয় প্রকাশ করেছেন। তবে আমরা মনে করছি এলাকার নাম ও জনগোষ্ঠীর পরিচয় সরাসরি প্রকাশ করলেও তিনি যে সময়ে কাজ করেছেন তার প্রকাশিত তথ্য বা বর্ণনা স্থানীয়দেরকে কোন ঝুঁকির বা বিপদের মুখোমুখি করবে বলে আমাদের মনে হয় না। বরং সাম্প্রতিককালে অধ্যাপক হারার গবেষণা এলাকা পরিদর্শনের সময় আমরা লক্ষ করি ঐ অঞ্চলের মানুষ অধ্যাপক হারা সম্পর্কে জ্ঞাত এবং এথনোগ্রাফিটি যে তাদের গ্রাম ও তাদের বংশধরদের নিয়ে রচিত এতে করে তারা গর্বিত। আনাম তাঁর পর্যবেক্ষণে দেখেন যে, গ্রামবাসীদের অনেকে এথনোগ্রাফিটিতে তাদের বংশধরদের নাম খুঁজছেন এবং নাম পেয়ে গেলে খুবই আনন্দ বোধ করেছিলেন। অন্যদিকে যারা তাদের বংশধরদের নাম এথনোগ্রাফিতে পাননি তারা খুশি হতে পারেন নি। ফলে এ এথনোগ্রাফিটিতে স্থানের নাম প্রকাশিত হওয়ার কারণে বাংলাদেশ ভূখন্ডের উপর রচিত প্রথম এথনোগ্রাফিটির ভৌগলিক অবস্থান, এথনোগ্রাফিক তথ্য ও মানুষজন সম্পর্কে জানতে পারছি। পরবর্তীকালে কোন গবেষক যদি ঐ এলাকার পরিবর্তন বোঝার জন্য গবেষণা করেন তাহলে এই এথনোগ্রাফির ভৌগলিক অবস্থান বা জনগোষ্ঠীর নামগুলো গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে

বলে আমরা মনে করছি। যদি এলাকার নাম বা মানুষের নাম প্রকাশিত না হতো তাহলে হয়তো ঐ এলাকা বা মানুষজনকে খুঁজে পাওয়া বা সেই রূপান্তরগুলো বোঝা সম্ভব হতো না। এই দিক বিবেচনা করলে নাম প্রকাশের বিষয়টি পরবর্তীকালের গবেষকদের কাজের সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখবে। ফলে আমরা মনে করছি, গ্রামীণ সমাজের রূপান্তর বোঝার জন্য বা রূপান্তরের ধরন চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে নাম প্রকাশের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

তথ্যসূত্র

আহমেদ, মহিউদ্দিন (২০১৪, ডিসেম্বর ১৬), জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে, বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে. bdnews24.com. সংগৃহীত হয়েছে https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/23170

Anam, M. (2017). *Majmawalas and sexual health promotion in Bangladesh: An ethnography of street healers in Dhaka City* (Doctoral dissertation). Retrieved from http://eprints.qut.edu.au/

Arefeen, H. K. (1986). Changing Agrarian Structure in Bangladesh: Shimulia, a study of a peri urban village. Dhaka: Centre for Social Studies.

Arens, J. and Beurden, J. (1977) Jhagrapur: poor peasants and women in a village in Bangladesh. Birmingham: Third World Publications.

Bertocci, P. J. (1970). Elusive villages: social structure and community organization in rural East Pakistan, (Doctoral dissertation). Michigan State University, Retrieved from http://eprints.qut.edu.au/

Bernard, H. R. (2006). Research methods in anthropology: Qualitative and quantitative approaches. Lanham, MD: AltaMira Press.

Clifford, J., Marcus, G. E. (1986). Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley: University of California Press.

Gaudefroy-Demombynes, M. (1950). *Muslim Institutions.* London and New York: Routledge

Hara, T. (1991) *Paribar and Kinship in a Moslem Rural Village in East Pakistan.* Tokyo: Institute for the study of Languages and Cultures of Asia and Africa.

Jahangir, B. K. (1979) Differentiation, polarisation, and confrontation in rural Bangladesh. Dhaka: Centre for Social Studies.

Jansen, E. (1983) Rural Bangladesh: Competition for Scarce Resources. Bergen: Chr. Michelsen Institute, DERAP Publication.

Jeffery, A. (1959). The family in Islam. In Anshen, R.N.(ed.), *The Family: Its function and destiny* (pp. 201-238). New York: Harper & Brothers.

Kaiser, K. (2009). Protecting Respondent Confidentiality in Qualitative Research. Qualitative Health Research, 19(11), 1632–1641. https://doi.org/10.1177/1049732309350879

Mead, M. (1928). Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilization. New York: William Morrow & Company.

Murphy, E. & Dingwall, R. (2001). The ethics of ethnography. In Atkinson, P., Coffey, A., Delamont, S., Lofland, J., & Lofland, L. Handbook of ethnography (pp. 339-351). : SAGE Publications Ltd doi: 10.4135/9781848608337

Gaudefroy-Demombynes, M. (1950). Muslim Institutions. London and New York: Routledge

Uberoi, P. (1991). Tadahiko Hara (1934-1990). Contributions to Indian Sociology, 25(2), 329–330. https://doi.org/10.1177/0069966791025002010

van Schendel, W. (1981). Peasant Mobility: the odds of Life in Rural Bangladesh. Assen: Van Gorcum.

Yamaguchi, Masao (1991), Foreword. In Hara, T. *Paribar and Kinship in a Moslem Rural Village in East Pakistan* (p. i). Tokyo: Institute for the study of Languages and Cultures of Asia and Africa.